অষ্টমীটোলা ও
৫০টি গল্প

তৃপ্তি সান্ত্রা

পুনশ্চ

॥ লেখকের কথা ॥

নদী, নারী, পাখসাট... ৫০টি গল্পকে এইভাবেই ভাগ করেছি। নদী আমাদের সবারই একটা অন্তর্লীন জীবন। এই নদীকে ঘিরেই জীবন লীলা।

আটের দশকে মাথা গোঁজার জন্য শহরের হৃৎপিণ্ড ছেড়ে শহরতলির নির্জনতায় গিয়েছিলাম। পুকুর, আমবাগান, কাশফুল, ইঁটভাটা আর দূরের অর্দ্ধবৃত্তকার রেল লাইনে ধায়গাড়ির আলোকিত জানালা। শহরের সবচেয়ে সাজানো গোছানো, সুবিধাজনক পাড়ার অবস্থান ছেড়ে অচেনার আনন্দ উপভোগের এই বিলাস বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। ১৯৯৮ সালে উনিশ মাইল দূর থেকে মা গঙ্গা ধেয়ে এলেন আমার শহরে। একতলা বাড়ির লিনটন অব্দি জল। এক মাস বাড়ি ছেড়ে ছিলাম ফেলে আসা কলোনির ভিটেয়। জল নেবে গেলে ফিরে এসেছি। কিন্তু ভাঙনে যে গ্রামগুলো তলিয়ে গেল তার অধিবাসীরা ফিরতে পারেননি। কৃষি জমি, ভিটেমাটি হারিয়ে তারা উদ্বাস্তু হলেন। সম্পন্ন গৃহস্থ হলেন ভিখিরি বা ভিনদেশে পাট খাটতে যাওয়া লেবার। সংখ্যালঘু পরিচয়ে যাদের খুব সহজেই বাংলাদেশি বলে ফাটকে পোরা যায়। বন্যা বিধ্বস্ত, বন্যাপীড়িত আমি কীভাবে যেন কালিয়াচক-২ এর কেবি ঝাউবনা, গোলোকটোলা, আলাদিটোলার নদী ভাঙনের মানুষের সঙ্গে একাত্ম হই সেই থেকে। বারবার ছুটে ছুটে যাই।

এরই মাঝে একবিংশ এলো—বিশ্বায়নের পৃথিবীতে আঘাত এসে পড়ল রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমতার ওপর। শহরেও ভাঙন। ক্ষমতার দাপ—উন্নয়নের জন্য উচ্ছেদ। ভিটেমাটি নেই। পুরো শহরটাই বাজার—শপিং কমপ্লেক্স। হাইরাইজ দাপটে তলিয়ে গেল সাবেকী বসতবাটি। হাইরোড, রাস্তা, গলি—সবই বাজারের। হাতের মুঠোয় দুনিয়া, বাজার। আমার ধান পান গান ছড়িয়ে গেছে উন্নত বিশ্বের কোণে কোণে—ভাবলে কী রকম অরগ্যাজম্ হয়, না? কিন্তু এখনও রাস্তা পেরোলে জাতি, জেলা পেরোলে ধর্ম, রাজ্য পেরোলে মাতৃভাষা নিয়ে প্রশ্নের সম্মুখীন হই। দেশ পেরিয়ে বিদেশে যখন, একমাত্র তখনই আমরা ভারতীয়।

বিশ্বায়নের থাবার নিচে ছিন্নভিন্ন নদীকুলের মানুষ। নদীও মৃতপ্রায়। সর্বগ্রাসী প্লাবনের মুখে দাঁড়িয়ে কিছু অক্ষর নিয়ে নোয়ার নৌকায় উঠে পড়ার প্রয়াস আমার।

আমাদের। নতুন পৃথিবী পুরোনো পাঠক্রম। নতুন পৃথিবী নতুন পাঠক্রম। এই পরিবর্তিত অবস্থায় কেমন আছে মেয়েরা? দামাল বাজার তাদের টেনে বের করেছে পথে। কাজের বাজার লড়িয়ে দিয়েছে নারী পুরুষকে। সংঘাত অনিবার্য। এই সব চাপে তাপে কেমন আমাদের প্রেম, জীবন, যৌবন যাপন! সংঘাত কী মানুষ মানুষীর—নাকী বিপন্নগ্রহের লোভী মানুষের সঙ্গে সর্বগ্রাসী বাজারের? আগুন আর জলের লড়াই?

২০০৬ সালে আমার প্রথম গল্পগ্রন্থ 'অষ্টমীটোলা' প্রকাশিত হয় সমীরণ মজুমদারের প্রকাশনা 'অমৃতলোক' থেকে। প্রকাশক প্রয়াত। 'অষ্টমীটোলা' ও নিঃশেষিত। 'অষ্টমীটোলা'-র বাইশটি, পরশপাথর প্রকাশনার ১০টি গল্পর ৫টি, গাঙচিলের 'রাত রোয়াকে—বুদ্বুদ যাপনের ২৫ আখ্যান' থেকে ১টির সাথে নতুন তেইশটি গল্প নিয়ে এই সংকলন।

নিটোল গল্প নয়। কাহিনি নয়। জলবালু খেলায় পাখসাট দিয়ে উড়ান ...এই আখরগুলি আগ্রহ আর যত্ন নিয়ে প্রকাশ করলেন পুনশ্চ-এর সন্দীপ নায়েক। চির ঋণী রইলাম তাঁর কাছে।

১২.১১.২০১৮

তৃপ্তি সান্ত্রা

সূচিপত্র

নদী

অষ্টমীটোলা ১৩
যামিনীর যপতপ ২৩
ঘোলাজলের উর্দি ৩১
দেড় হাতের কলম ৩৭
জলবালু-কথা ৪৬
ফ্যাক্ট ফাইন্ডিংস ৫১

নারী

ন্যাকড়া পুতুল ৫৯
কদম মুহূর্ত ৬৯
লালন পর্ব ৭৪
রোগা হতে যাওয়া ৮৪
বোনাস পয়েন্ট ৯২
বাস্তু সাপ ১০৩
মুনলাইট শপিং ১১০
আঙুর ফল ১১৪
ক্রমশ প্রকাশ্য ১২০
কভারেজ চাই ১২৭
লেউড়ির মেলা ১৩২
অনুবাদক ১৪১
কদম রেণুর মতো ১৪৭
অপরাজিতা ১৫৪
ডেলি প্যাসেঞ্জার ১৬৩
র‍্যাশ ১৬৮

চিঠির ডানায় ১৭৩
কনে দেখা ভাত ১৭৭
লাল কালির দিন ১৮২
পাউচ প্যাক ১৮৭
কামরাঙা ঘর ১৯৩
পরিকথা ১৯৯

পাখসাট

ভালভুলএ ২০৭
শতবর্ষের বৃত্তান্ত ২১৫
চাঁদের বারান্দায় ২২৪
আনফ্রেন্ড ২৩০
গাছ পুরাণ ২৩৬
পাঁচটা পঁয়তাল্লিশের বিকেল ২৪০
নুন জড়ানো গল্পকথা ২৪৫
দহনবেলা ২৫২
অথই ইংরেজি সিলেবাস ২৬৫
গতিজাড্য ২৭০
মোহন বাঁশি ২৭৬
এক সন্ধ্যার জলছবি ২৮২
বিজ্ঞাপন বিরতি ২৮৭
নেক্সট্ ২৯২
একটি ভ্যাট প্রতিবেদন ৩০১
সবুজ অ্যালবাম ৩১৬
একলা মে ৩২২
দেয়ালা ৩২৮
রামধনু বেলুন ৩৩৬
এক অসফল দ্বিপাক্ষিক বৈঠক ৩৪০
আধখানা-হৃদয় ৩৪৮
সাদা-কালো অ্যালবাম দিন ৩৫৫
বিপিএল রূপকথা ৩৬১

।। অষ্টমীটোলা ।।

আর এখন ছোটোছোটো গুঁড়ি গুগলি ছেলেমেয়ের দল জলে এমন ঝাপাচ্ছে, গুবগুব করে সাঁতার কাটছে, জল ছিটোচ্ছে যেন কিছুই হয়নি কোথাও। তাদের বাঁ হাতে কুড়ি নং স্পারের লেজ। একতলা দুতলা পাথর ফেলে জাল দিয়ে বাঁধা। ডানদিকে সাত নং মাটির বাঁধ। একশো মিটার যাবার পর যে বাঁধ কিছুটা ভাঙা আর গঙ্গা যেখান দিয়ে ছুটে যেতে চাইছে পাগলা নদীর সঙ্গে মেশার জন্য। সাত নং বাঁধের আরো পেছনে নতুন আট নং বাঁধ। গঙ্গার পাড় থেকে আট নং বাঁধ অব্দি চরের বুকে পাথর ফেলা। পাথরে বাঁধা বুক—তবু কি বাঁধা যায়, টিকবে?

কুড়ি নং স্পরের লেজ যা কিনা ইংরাজি ডি অক্ষরের মতো আধা গোল, তার মাথায় দাঁড়িয়ে অষ্ট দেখল ঠিক নীচেই পাথরের গা ঘেঁষে পাক খাওয়া জল। দূরে অস্পষ্ট চর। জল ঘোলা ঘূর্ণিময়, কিন্তু শব্দহীন। বাঁদিকে ঠিক নীচেই ভেসে যাওয়া মৃত গোরুর শব ঠোকরাচ্ছে গুটিকয় কাক। রেবেকা ভেসে থাকা গোরুর কোণাকুনি হাত তুলে বলে—

চিনা লাগে, ঐখানে আলাদিটোলা?

বিস্তীর্ণ জলরাশির মধ্যে কোথায় কোন্ গ্রাম আর কোথায় কার ঘর বোঝা অসম্ভব। রেবেকা তবুও বলে চলে—ঐখানে বুঝতে পারছ তো কবরখানা। আর ঐ দিকটায়—ঐ যে নৌকাটা যাচ্ছে—ঐ ওখানে সাদেক সামসুটোলা।

অষ্ট ফ্যালফ্যাল করে তাকায়। কোথায় কী—শুধু জল। জলের ওপর আবার চিহ্ন থাকে? নৌকাটা এক্ষুনি ছিল গঙ্গাভবনের কাছে, ওখান থেকে বাইতে বাইতে চলে এল ওদের সামনে—আবার বাইতে বাইতে এগিয়ে যাচ্ছে রাজমহলের দিকে। আর মরা গোরু ভেসে ভেসে চলে উজানে। নেশা পাওয়া মানুষের মতো রেবেকা বলেই চলেছে—ঐখানে—ঐ যে উনিশ নং স্পারের মাথায় ঐ মসজিদ আর তালগাছ।

বকরি ঈদের সময় সেবার এলা না—মনে নাই?

অষ্টর কোনো কথা কানে ঢোকে না। একবছর আগেও এসেছিল সে। তখনও মসজিদ, পাকাঘর, তালগাছ আর আলাদিটোলা ছিল। এখন স্বপ্ন সব। রেবেকা কী বলতে চাইছে—কেন এত বলে যাচ্ছে, অষ্ট জানে। সত্যিগুলো স্বপ্ন হয়ে যায়, কিন্তু স্বপ্ন সত্যি হয় না—তার মতো কে জানে? কেউ না। কিন্তু রেবেকাকে বোঝানো যাবে না। সে ভাবে দূরের শহরে গেলেই শক্তমাটির সুখ। আর তাই তার চোরা ঈর্ষা—কথার মাঝেই ছুঁড়ে দেয় অদৃশ্য খোঁচা—চিনা লাগে?

যেন বছর চার গাঁ ছাড়লেই সব ভোলা যায়। শ্রীকান্তকে বিয়ে না করে তার উপায় ছিল না। অষ্টর সুন্দর মুখ আর শরীর দেখেছিল শ্রীকান্ত গাঁয়ে পিসির বাড়ি এসে এক

কোজাগর রাতে। সিংপাড়ায় শ্রীকান্তর দুর্গাপিসির বাড়ির দুখান বাড়ি পরে অষ্টর মামাবাড়ি। লক্ষ্মীপুজোয় অষ্ট এসেছিল মামির পুজোর জোগাড়ে—লক্ষ্মী পুজোর আগের দিন মামি ছোঁওয়া পড়েছিল সেবার। পালপাড়া থেকে তাকে ডেকে এনেছিল মামা। মামাবাড়ির উঠোনটা বড়ো। সারা উঠোনে লক্ষ্মীর পা, ধানশিষ আর গোলাঘর এঁকেছিল অষ্ট। নদী তো কবে থেকেই ভাঙছে। তার বাপ কাকা কালিয়াচক দুই নম্বর ব্লকের সাবেক পঞ্চানন্দপুরের পলাশগাছি থেকে চলে এসে চেথরু মহাজনটোলায় আছে প্রায় বছর তিরিশ। এখন এর নামও পঞ্চানন্দপুর। গঙ্গা তার আদি বহতা পশ্চিম তটভূমি ছেড়ে ক্রমাগত পুবদিকে চলে আসছে। কাটতে কাটতে ভাঙতে ভাঙতে আসছে। পুব কাটছে আর পশ্চিমে জেগে উঠছে চর। চরে ফসলের সবুজ, চিকচিকে বালু। এপারে তাদের গ্রাম বসত ভিটে চাষের জমি দিঘি পুকুর পাশের পাড়া ঝোপজঙ্গল জনপদ সব ডুবে যাবে। সব খেয়ে নিয়ে, জিভ চেটে মুখ ধুয়ে শীতকালে ভিজে বেড়াল হয়ে যাবে নদী। আর নদীর বুকে জেগে থাকা চর? সেই পলি ভেজা কালো চরে তবুও ফসলের বোধন হবে—শস্যে ধানে দানা বীজে পা ফেলে লক্ষ্মী আসবেন।

লক্ষ্মী পুজোর দিন খই বাতাসা জোছনা ওঠে। আকাশে বাতাসে বাঁশবাগানে আম কাঁঠাল গাছে কলমিলতায় ভাঙা ঘরের চালে গঙ্গার কালো জলে আর ধূ ধূ চরে জোছনার আলপনা। চালের গুঁড়ো বেঁটে সারা উঠোনে সেই জোছনা আঁকতে চেয়েছে অষ্ট সারাদিন। গাঁয়ের মরদ বউ বিটি হেঁদু মোছলমান ধনী গরিব সবাই জানে আজ যেখানে ঘর গেরস্থালি, সামনের বা পরের বর্ষায় যেখানে বেবাক পানি—জল। তবু অলৌকিক যদি কিছু ঘটে! জল যদি আবার পুরোনো পথে চলে। এই আশ্চর্য জোছনা রাতে পশ্চিমের ধূ ধূ বালুচরের ওপর বসে থাকা কোনো এক জোছনা শরীরের জন্য গঙ্গা যদি পাগল হয়ে সেদিকে ছোটে। এরকম ভাবতে গিয়ে অষ্ট বোঝে—তা হবার নয়। গঙ্গা কি পুরুষ মানুষ যে লক্ষ্মী ঠাকরুনকে দেখে ছুটবে? সে বরং পাগল হবে পাগলার সঙ্গে মেশার জন্য। পাগলা কি পুরুষ? এইরকম একটা প্রশ্নে করেওছিল সে হেনাবৌদিকে।

—গঙ্গার স্বামী তো শিব বৌদি।

—হ্যাঁ। মহাদেব।

—তবে পাগলার সঙ্গে মেশার জন্য ছুটছে যে এত।

—স্বামীর জন্য অতো ছোটে নাকি, পাগলা ওর নাগর।

গঙ্গা পুরোনো খাতে পাগলার সঙ্গে মিশে গেলে পুরো ভূগোল পাল্টে যাবে এখানকার। হেনা বৌদির ঠাট্টা পছন্দ করেনি তার শাশুড়ি।

ও আবার কেমনপারা কথা! পাগলা, টাঙ্গন, মহানন্দা ফুলাহার—এরা সব বুন।

অর্থাৎ কিনা বোন।

নদীতে নদীতে যদি বা দেখা হয়, বোনে বোনে হয় না—এমন একটা কথা অষ্ট শুনেছে। এখন কত যানবাহন কত যোগাযোগ—বাস, ট্রেন, প্লেন, ফোন। এখন কি ওসব প্রবাদ খাটে? বোনে বোনে দেখা হয়, নদীতে নদীতেও হয়তো দেখা হয়। আবার ইচ্ছে না থাকলে পাশে থাকা মানুষও হারিয়ে যায়। দেখা হয়। চোখাচোখি হয়। কিন্তু

তবু দেখা হয় না। দৃষ্টিতে আয়না থাকে না কোনো। সেদিন অষ্ট মনে প্রাণে লক্ষ্মীকে ডেকেছিল। জলে ধুয়ে যাবে সব—তবু নক্‌শা, তবু ফুলপাখি। মূর্তি তো বিসর্জনেই যায় তবু শিল্পী কত কষ্ট করে যত্ন নিয়ে গড়ে। শ্রীকান্ত কখন পেছনে দাঁড়িয়েছিল—বাঃ, বেশ তো!

মুখ তুলে অপরিচিত পুরুষ দেখে অষ্ট আঁচল টেনে অষ্টমীবালা হয়ে পালাতে চেয়েছিল তাড়াতাড়ি।

—কোথায় ঘর?

—পালপাড়া।

—অজয়ের মা কে লাগে?

—পিসি।

সরল হাসি হেসেছিল শ্রীকান্ত—ভালো, সুন্দর।

—কী?

—তুমি। তোমার আলপনা।

কথাবার্তা স্পষ্ট। স্বভাব ডাকাবুকো। অষ্টমীবালা মজেছিল। কয়েকদিনের মধ্যেই শ্রীকান্তর সব জানা শেষ। অষ্টমীবালা, তার বাড়ি, বাবা-মা এবং বিয়ের প্রস্তাব। তারা মাত্র দুদিন সবার আড়ালে দেখা করেছিল। বলার কথা অনেক ছিল, তবু কিছুই বলা হয়নি। শ্রীকান্তর হাতের তালুতে, আঙুলে, নখে, নখের ডগায় গনগন করছিল আগুন। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে, সাদীপুরের পথে পথে অষ্টমীবালা টের পাচ্ছিল সেই আঁচ। আর কোনদিনও যা ইচ্ছে হয়নি, তাই হল অষ্টমীর। মোমবাতি হতে চাইল সে। শ্রীকান্তর তাপে একদম গলে যেতে চাইল। পুড়িয়ে ফেলতে চাইল শরীর। আর ক্রমে ক্রমে টের পেল সে আর অষ্ট নয়, অষ্টমী নয়, অষ্টমীবালা। গনগনে শ্রীকান্তর সামনে ভালোলাগায়, উত্তেজনায়, আবেশে, মুগ্ধতায় কথা জড়িয়ে যায়। প্রথম দিন হাঁটতে হাঁটতে সাদীপুর পেরিয়ে বালুয়া চরের রাস্তা ধরে শ্রীকান্ত। এত হাঁটা অভ্যাস নেই। দিনের বেলা গরম প্রচণ্ড, নতুন প্লাসটিকের চটিটা বড়ো শক্ত—বুড়ো আঙুল লাগছে। তবু অষ্টমী বলতে পারছে না—আর যাব না। আর এরকমই থেকে গেল বরাবর। বিয়ের দুবছর পরেও এক বছরের সুশান্তকে কোলে নিয়ে কার্তিকের মেলায় মিষ্টির দোকানে বসে শ্রীকান্তর পছন্দের জিলিপি খেল সোনা মুখ করে। লাল হলুদ বড়ো দানার মতিচুরের লাড্ডু আর ভ্যাটের খই কেনার কথা মুখ ফুটে বলতে পারল কই! তারও যে আগুন আছে, সেও পোড়াতে পারে একবারও বোঝাতেই পারল না। আটপৌরে হল না কখনও। ছেলেবেলার মতো অষ্ট হল না। জবুথবু কাপড় চোপড়ে অষ্টমীবালা শহরের সদরঘাটে গেল কাঠের মিস্ত্রি শ্রীকান্তর সঙ্গে। বিয়ের পর বাড়িতে প্রথম আসার দিনগুলো কেমন রূপকথার মতো। গাছগুলো—আম কাঁঠাল, মাদার, শিমুল—ওরাও যেন ঘোমটা দিয়েছে অষ্টমীবালার মতো। আকাশ যেন রোদের টোপর পরে বর সেজেছে। আর কখনো আলোছায়ায় জড়িয়ে ধরছে গাছগাছালি। কখনো আবার চড়চড় করে রোদ উঠে জ্বালিয়ে দিচ্ছে সারা শরীর। ঘোমটা ফেলে গাছ গাছালির তখন ডোবা, পুকুর গাঙের জলে লাফিয়ে পড়ার ধুম। অষ্টও ঝাঁপাবে শ্রীকান্তর বুকে! ঘোমটা ছেড়ে লজ্জা বস্ত্র

ছেড়ে—যাঃ! চকচকে সিন্থেটিক, নাকে, কানে সোনা আর হাতে গলায় ঝুটো সোনার সোহাগে ঘেমে, নেয়ে কেমন ঝলমল করছে অষ্টমীবালা। পাড়ার লোক দেখছে। অষ্টমীর বান্ধবী ফুল, রেবেকা দেখছে অবাক চোখে। ঘেমে নেয়ে গেছে অথচ অষ্টমীবালা বাপের বাড়ির দেশে এসেও ঘোমটা খুলছে না দেখে ফাজিল লীলাই বলেছিল—এখানে আবার এত ঘটঘটানি ঘোমটা কেনরে অষ্ট, লজ্জা কাকে দেখে—লাজ ভাঙেনি?

অষ্টমঙ্গলে তো লজ্জা না-ই ভাঙতে পারে, কিন্তু চার বছরের বিবাহিত জীবনেও লজ্জা ভাঙল না অষ্টমীর। নদী চরে দাঁড়িয়ে রেবেকা জলের মধ্যে ডুবে যাওয়া ডাঙার স্বপ্ন দেখাতে ব্যস্ত। অষ্টর চকচকে সিন্থেটিক, ব্যাকক্লিপ, কপালে থেকে সিঁথিতে টানা সিঁদুরের মিথ্যে ছলে তার বুকের ভাঙা চরের শব্দটুকু ঢেকে গেছে, কোনও 'পোহাল' অর্থাৎ ঘূর্ণি নেই তার শান্ত মুখে। শোনা যাচ্ছে না কিছু। নদীর অন্তঃসলিলে তীব্র বেগ। নদীর নীচে পঁচিশ/তিরিশ বা চল্লিশ/পঞ্চাশ ফুট বা আরো বেশি জায়গায় অন্তঃস্রোত তীব্র গতিবেগ নিয়ে একই জায়গায় আঘাত দিতে থাকে। ওপরের মানুষ টেরও পায় না তা। তারপর একসময় চিড় ধরে মাটিতে আর অবশেষে তলিয়ে যায়। শুধু রেবেকা কেন লীলা, ফুল কেউ বোঝে না মাঝিটোলার এট্টুখানি জেগে থাকা চরের মতো অষ্টর অবস্থান। যে কোনো মুহূর্তে সে তলিয়ে যেতে পারে নয়—যাবে। এই মোটা শাঁখা, ল্যাপ্টানো সিঁদুর শ্রীকান্তকে বাঁধার অসহায় চেষ্টা। বাঁধের বুকে বোল্ডার ফেলে রাখার মতো বেকার সে সব। কিন্তু গ্রামের বন্ধুদের কাছে সে শহরের সুখ। একটু খোঁচা থাকেই তাদের কথায়। ঈর্ষার আগুন চাপা দেওয়া যায় না। ঈর্ষা কাকে? না অষ্টকে। অষ্ট হাসে।

এবং এই হাসি ভয়ংকর বেমানান, কারণ রেবেকা তখন তার মেরুনাদির ডুবে যাওয়া বাড়ির অল্প জেগে থাকা রসুইয়ের খোঁটা দেখাচ্ছিল। গোয়াল, দু দুটো কোঠা, উঠোন, রসুইঘর, বাগান, কলপাড়, কুয়ো, পায়খানা—কোনও কিছুর বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই, আর অষ্ট কিনা হাসে।

—হাসি লাগছে, দুর্দশা দেখে?

—হাসি-বাঃ—হাসব কেন?

—সুখী লোকেরা দুঃখী মানুষ দেখে হাসে না?

—সুখী কে—কীসের সুখ?

—গরম ডাঙায় গরম ভাত খেয়ে গরম স্বামীর পাশে শোবার সুখ।

—আমারও ডোবা ঘর।

অষ্টর গলার স্বর অসহায়। শূন্যে ঝুলে থেকে দোলে। রেবেকার সেই ফাঁকটুকু ধরার কথা নয়।

কাঠচেরাই কলগুলো বাঁধের ওপরে। তাই নদীর পাশে ঠিক নয়, প্রায় নদীর মাঝামাঝি জায়গায় ঘর তুলেছিল শ্রীকান্ত। গ্রীষ্মে মরা নদী। কিন্তু বর্ষায় থই থই জল। তখন ঘর ছেড়ে বাঁধে উঠে যেতে হয় মাস তিনেকের জন্য। নদীর বানে ঘর ডুবে যায়। টিউবওয়েল ডুবে যায়।

নদীর বুক ছেড়ে তখন তারা বাঁধের উপর। তখন তারাও ত্রিপল। আর যখন প্রবল বন্যা, তারা উঠে যায় আশেপাশেব ইশকুল কলেজে। ডোবাঘর বলতে রেবেকা এটুকুই

বোঝে, এর বেশি নয়। সে বলে—ডোবা ঘব তো কেটে নেবে যায় না। জল কমলে তো আবার ফেরা যায় ঘরে। এদিকের মতো তো নয়—

রেবেকার গলায় প্রখর তীব্রতা। ঝাঁঝ। কথা বলতে বলতে তারা আসে গঙ্গাভবনের প্রাচীরের পাশে। প্রাচীর ভাঙা। সেখান দিয়ে গলে ভবনের ভেতরে ঢুকে যায় অষ্ট রেবেকার সাথে। গঙ্গাভবনের সামনের বাঁধটুকু টিকে আছে। তারপর চর। আর তার অনন্ত জলরাশি। স্টিমার বাঁধা ঘাট, উনিশ নম্বর স্পার সব জলের তলায়। জল ডানদিক ঘুরে যেতে চাইছে ভবনের পেছন দিকে। ভবনের গাছগুলো কেটে ফেলার কথা হয়েছিল—গ্রামের লোকের বাগড়ায় কাটা হয়নি। জোড়া তালগাছ দুটি পাশাপাশি দেখতে বেশ। শ্রীকান্ত প্রথমবার এসে ওই গাছের তলায় বসেছিল। গাছের তলায় দাঁড়ায় অষ্ট। আর কি ফেরা যায় সেইসব প্রথম সুখের নাগরদোলায়? যায় না, যাবে না। তবু তাকে খোঁচা মারে রেবেকা। ও জানে না অষ্টরও ভাঙা ঘর। ডোবা ঘর। সেই ডোবা ঘরের জল নেবে, চর জাগে না। কাটে—কেটে কেটে যায়। কেটে যাবে। প্রথম প্রথম শ্রীকান্ত একটু নরম নরম বলত। বলার চেষ্টা করত—এখনও লাজ ভাঙেনি। এমন শক্ত হয়ে থাকিস্। ভাললাগে না। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রোদ চড়ে।

—সোন্দর মুখ, এমন গা গতর ভারী দেখে বিয়ে করলাম। এমন কাঠপারা মেয়েছেলে হয়?

সুশান্ত এল তবুও। আর ছেলের দেড়বছরের মাথায় শ্রীকান্ত শিলিগুড়ি দেশে গেল ব্যবসা করতে। সে দেশে ধুলোয় পয়সা। সেই ধুলো মাখতে গেল শ্রীকান্ত। অষ্টর কাছে সামান্য টাকা পয়সা, ঘটিবাটি যা ছিল ফুরল। কোনও খবর নেই। পয়সা শেষ হয়ে গেল। অষ্ট প্রথমে লুকিয়ে লুকিয়ে তারপর খোলাখুলি কাজে লাগল দূর লোকালয়ে। তাদের বাঁধের পাশের পাড়াগুলোতেও কাজ মেলে। কিন্তু লজ্জা। খেটে খাওয়ার লজ্জায় দূর পাড়ায় কাজ। সকালে বেড়িয়ে হাউসিং পাড়াতেই কেটে যায় তার সারাদিন। রাত্রি করে বাড়ি ফেরে সুশান্তকে ট্যাকে গুঁজে। পাড়া ঘুমোলেই সে বাড়ি আসতে চায়। কারণ রাস্তাঘাটে অসংখ্য চ্যানেল খোলা। কত রেডিও। কত টিভি। কত খোলা খবরের কাগজ। ইচ্ছে না থাকলেও তারা শ্রীকান্ত সংবাদ দেয়। সেই যে এক শিলিগুড়ি দেশ। তার চারদিকে পাহাড়। পাহাড়ে ঝরনা, চা-বাগান, কমলালেবুর গাছ। সেখানে ধুলো কাদা নেই। জল জমে না রাস্তায়। আর সেখানে হলুদ গালের মেহেন্দি চুলের তিন ভাই চম্পার এক বোন পারুল ঠোনা মেরে নিয়ে গেছে অষ্টমীবালার শ্রীকান্তকে। গোরু বকরি যাতে না খায়, অষ্টমীবালার মতো কীটপতঙ্গ যাতে না আসে তার জন্য শ্রীকান্তর চারদিকে শক্তপোক্ত বেড়া দেওয়া। দূরত্বের বেড়া। ভায়েদের বেড়া। পারুল কন্যার বেড়া। শ্রীকান্ত ফেরে না। প্রথম প্রথম তাও পাঁচ ছমাস অন্তর আসত। দু-এক ঘন্টার জন্য। মায়ের কাছেই খেত। পাড়ার বৌদি, মাসিমা ঠ্যালা দিত—যা অষ্ট। সেজেগুজে যা। ঘরে ডেকে আন। একটু রং ঢঙও জানিস্ না ছুঁড়ি। আর অষ্ট তখন অষ্টমীটোলা। আড়চোখে দেখে লোকটা সোন্দর হয়েছে অনেক। রংচঙে চেক শার্ট। চোখে গগলস্। শিলিগুড়ির দু-দশ হাতের মধ্যেই বিদেশ। সুশান্তর জন্য একটা বোতাম টেপা খেলনা, দুটো গন্ধ লজেন্স—তার জন্য কিছুই না।